প্রতিরোধে দামামা

অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশানের রাজ্য মুখপত্র

তীর কাঁড় আর টাঙ্গি হাতে, সদদারের পারা তুই যা
রুখে দাঁড়া মঙলি, রুখে দাঁড়া ।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০২১

হামলা দিয়ে, মামলা দিয়ে
আন্দোলন রোখা যায়নি, যাবেনা।

সহায়ক মূল্যঃ ১০ টাকা

প্রতিরোধে আমার দেশ সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক ২১/১/১ ক্রিক রো, কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
সম্পাদকঃ অত্রি ভট্টাচার্য। প্রকাশকঃ ত্রিয়াশা লাহিড়ী।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	১
দাবি একটাইঃ ক্যাম্পাস খোলা চাই	১
প্রতিরোধে আফগান নারী	২
সিলেবাসে কাঁচি, ভাবনায় ফ্যাসিবাদের থাবা	৭
'দ্রৌপদি ইজ অ্যাপ্রিহেন্ডেড বাট নেভার ডেসট্রয়েড' – দ্রৌপদীদের মৃত্যু নেই	৮
মুজফফরনগর আভি ভি বাকি হ্যায়	১০
দেশ বেচার পাইপলাইনঃ অর্থনীতির বিজাতীয়করণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন	১৩
পিছিয়ে পড়ল যারা, তারা গেল কোথায়? (লকডাউন, দলছুট আর গিগ ইকোনমির কিসসা)	১৪
সংগঠনের পাতা থেকে	১৬

ছবি কৃতজ্ঞতাঃ
জিৎ নট্ট
নম্রতা বালা

যোগাযোগঃ
৬২৯০৩৯৪২২০ (অত্রি)
৭৯৮০৫৬০৭৩৪ (ত্রিয়াশা)

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?

সম্পাদকীয়

প্রতিরোধই হোক জনতার উৎসব

Revolutions are the Festivals of the Oppressed -লেনিনের এই কথাটি আজকের প্রতিপাদ্য হয়ে উঠতে পারে। আজকের ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ধূর্ত বেনিয়া আদানি-আম্বানির কাছে। ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে আমাদের স্বদেশ। ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করানো হচ্ছে অসম ও বৈষম্যমূলক ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থায়। বেকারত্বের পারদ যত চড়ছে তত বাড়ছে সুইগি-জ্যোমাটো ডেলিভারি-বয়দের ভিড়। সিলেবাসের 'মগজ-ধোলাই' যন্ত্রে রূপান্তর সম্পূর্ণ হচ্ছে অবাঞ্ছিত কাটছাঁটে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের 'ভাগ্যাকাশে আজ দূর্যোগের ঘনঘটা'। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট ইসলামী মৌলবাদের দানব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কাবুলের রাস্তাঘাট। এই ঘোর ক্রান্তিকালে মৌলবাদ,পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের ত্রিশঙ্কু আক্রমণের মুখোমুখি লড়ে যাচ্ছে বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা। মুজফফরনগরের কৃষক মহাপঞ্চায়েত। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বোরখাবিহীন একাকী মুক্তমনা-ছাত্রী। আজ রুখে দাঁড়ানোর দিন। পতাকা হাতে বিপুল প্রতিরোধে একা হলেও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এহেন প্রতিরোধই আমাদের কোভিড-পৃথিবীর বেড়া ডিঙিয়ে এক বিশ্বজনীন, সুস্থ ও শোষণবিহীন জনতার উৎসবের দিকে নিয়ে যাবে। যেখানে ভেঙে গিয়েছে সব অচলায়তনের দেওয়াল।

দাবি একটাই- ক্যাম্পাস খোলা চাই

ক্যাম্পাস, ক্যান্টিন, কলেজ আড্ডা, স্কুলে কাড়াকাড়ি করে টিফিন খাওয়া- এই অতি পরিচিত ছবিগুলো বিগত দু'বছরে যেনো আকাশকুসুম কল্পনায় পরিণত হয়েছে। 'সোশাল ডিসট্যান্স', 'অনলাইন ক্লাস', 'কোয়েরেন্টাইন'-এর মতো শব্দগুলো এই একুশ সালের অন্তিম লগ্নে দাঁড়িয়ে যেনো জানান দিচ্ছে 'নিউ নরমালে' আমরা উৎফুল্ল না হলেও কমবেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। স্মার্টফোনের ছোটো স্ক্রীনে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে গোটা ছাত্রজীবন। অথচ পরিস্থিতি কিন্তু মোটেই এতো সহজ নয়, লকডাউনের ফলে মানুষের গড় আয় কমেছে, কর্মী ছাঁটাইয়ের সংখ্যা লক্ষাধিক, জিডিপি এসে দাঁড়িয়েছে -২৫% এ। ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইন্টারনেটের খরচ জুগিয়ে পড়াশোনা নেহাতই বিলাসিতা অনেকের মতো মৌলালি বস্তির রাজিয়ার জন্যও, তাই ও মায়ের সাথে ট্রেনে চড়ে ছুরি-কাঁচি-ন্যাপথলিন-সেফটিপিন নিয়ে,বিক্রির আশায়। 'ডিজিটাল ডিভাইড'-র মতো শব্দবন্ধ বদলে গিয়ে যে 'ডিজিটাল এক্সক্লুশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে তা রাজিয়ারা বুঝতে না পারলেও, আর যে কোনোদিন স্কুলে যাওয়া হবে না, এইটুকু বুঝে গেছে ওরা। সরকারি হিসাবে ২০২১-এ তিন লক্ষ মাধ্যমিকের ফর্ম পূরণ হয়নি, তাদের নাম ও রাজিয়ার মতো স্কুলছুটের তালিকায় নথিভুক্ত হয়ে গেছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ দলিত শিক্ষার্থীর নামও বাদ পড়ে গেছে এই ডিজিটাল এক্সক্লুশনে। সারা ভারতের মাত্র এক তৃতীয়াংশ স্কুল পড়ুয়ার ইন্টারনেট পরিষেবা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরো ক্ষুদ্র অংশ নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করে। পরিকাঠামোর অভাবে কিছু সরকারি স্কুলের ছবি আরো খারাপ হওয়ায় (মাত্র ৮.১% শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাস করেন) NEP বা নয়া শিক্ষানীতির আওতায় সেই স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যেতে চলেছে। এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে খিচুড়ি পদ্ধতি বা পোশাকি নাম (অফলাইন ৬০% ও অনলাইন ৪০%) ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে হতে চলেছে, এহেন পরিস্থিতিতে রাজিয়াদের অবস্থা কি কল্পনা করা যায়? এই নিয়ে প্রচুর ওয়েবিনার, অনলাইন সেশান, অ্যাকাডেমিক

(এরপর বারোর পাতায়)

প্রতিরোধে আফগান নারী

"ইওর ফ্রিডম ইজ আওয়ার ফ্রিডম। ইওর অপ্রেশন ইজ আওয়ার অপ্রেশন।"

১৫ আগস্ট, ২০২১। ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা দিবসে দিকে দিকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হচ্ছে, সেই একই তারিখে সুদূর আফগানিস্তানে বছর কুড়ি পর ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে তালিবানদের হাতে। মৌলবাদের চরিত্র বদলায় না। ফলত, ১৯৯৬ সালের তালিবানদের সাথে আজকের তালিবানদের এতটুকু অমিল নেই। ঠিক যেমন এ'দেশে বছরের পর বছর ধরে বিজেপি-আরএসএস-এর চরিত্র বদলায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "আফগানিস্তানের আজকের দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য বহু আন্তর্জাতিক কুশীলব দায়ী। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন আফগান সরকারের নির্দেশে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ আফগানিস্তানকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার ঠান্ডা যুদ্ধের দৃশ্যপটে তুলে আনে। সোভিয়েত মদতপুষ্ট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে থাকা মুজাহিদীন শক্তিসমূহকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাগাতার অর্থ ও অস্ত্রের জোগান দিয়েছিল। এই ছিল তালিবানদের উত্থানের পটভূমি। ২০০১ সালে আফগানিস্তানের জনসাধারণ ও বিশেষত মহিলাদের স্বাধীনতা দেওয়া এবং তালিবান সহ দেশটির অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আবার সামরিক অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং আফগানিস্তান দখল করে নেয়। পরিস্থিতির সাম্প্রতিক বিকাশ ঐ আক্রমণ ও দখলদারির পেছনে যে কারণগুলোকে অজুহাত হিসেবে দেখানো হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। মার্কিন অধিকৃত আফগানিস্তানে জনগণ দখলদার সেনাবাহিনী ও তাদের ভাড়া করা অরাষ্ট্রীয় বাহিনীর বোমা হামলা, ড্রোন হামলা, ঘরে ঘরে নির্বিচার তল্লাশি ও হত্যার লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। মার্কিন আগ্রাসন আসলে তালিবানদেরই নিজেদের সুসংহত করার অবকাশ তৈরী করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আফগান সরকার সহ অন্যান্য মিত্রশক্তিকে বাদ দিয়ে তালিবানদের সঙ্গে একতরফা সমঝোতা করেছে। এর পরিসমাপ্তি ঘটে মার্কিন-তালিবান চুক্তিতে যা সকলের কাছে এটা স্পষ্ট করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রই তালিবানদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করছিল। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', 'গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ' এবং 'আফগান মহিলারাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ' – এহেন অজুহাতগুলোর মুখোশ খসে পড়ার সাথে সাথেই আফগানিস্তানকে পরাধীন করার এক হিংস্র ও নিষ্ঠুর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সামনে এসেছে।"

ক্ষমতায় আসার পর থেকে তালিবান শাসকেরা সকলের সামনে বড় মুখ করে বলেছে, বর্তমান শাসনে মহিলাদের স্বাধীনতা থাকবে। যদিও এই স্বাধীনতার মাপকাঠি হবে শরিয়ত আইন। বাস্তব বলছে, শরিয়ত আইনের সাহায্য নিয়ে মহিলাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা অসম্ভব। তালিবানদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি, আফগানের অসহায় মানুষেরা নিজেদের দেশ-ভিটেমাটি সমস্ত কিছু ছেড়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে পালাচ্ছে। উড়োজাহাজ থেকে পড়ে যাচ্ছে পলায়নরত মানুষ। কী বীভৎস সময়! কী বীভৎস দৃশ্য! মহিলা সাংবাদিকদের সরিয়ে বসানো হয়েছে পুরুষ সাংবাদিক। সাংবাদিক ও প্রতিবাদকারীদের উপর যথেচ্ছভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে তালিবানরা। এমতাবস্থায়,

তালিবানি শাসনের বশে আফগানিস্তানের নারীসমাজ কতখানি অনিশ্চিত, ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিঃসন্দেহে তা আন্দাজ করা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এরজন্য একটাও কাঁটাতার পেরোতে হয়না।

আফগানিস্তানে বছরের পর বছর ধরে মহিলাদের ক্ষেত্রে দু'রকম মতাদর্শের দ্বন্দ্ব চলছে। একদিকে রয়েছে, নারীর মুক্তি ও পূর্ণ স্বাধীনতা, অন্যদিকে রয়েছে, রক্ষণশীল। এই দুইয়ের মাঝে নিপীড়িত আফগান নারীকূল স্বপ্ন দেখতে ভয় পেয়েছে, কুঁকড়ে থেকেছে। যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, শাসকেরা তাদের বিভিন্ন অছিলায় অতি ক্রুর নিষ্ঠুরতার সাথে দমিয়ে রেখেছে। তবু, মহিলাদের পোস্টার হাতে, স্লোগান মুখে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গ্যাছে। তারা জানে, স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হবে। তারা জানে, আন্তর্জাতিক মিডিয়ার চোখ আফগানিস্তান থেকে সরে গেলে ফের তাদের উপর কুড়ি বছর আগের মতো অত্যাচার নেমে আসবে। কঠিন থেকে কঠিনতর হবে আফগান মেয়েদের দিন গুজরান।

নবপ্রতিষ্ঠিত তালিবানি শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টে মহিলারা বাদ পড়েছে। তালিবান মুখপাত্র সৈয়দ জেকরুল্লাহ হাশিমি জানিয়েছে, মহিলাদের কাজ কেবল সন্তান জন্ম দেওয়া। তিনি আরও বলেছেন, মহিলাদের কাজ মন্ত্রীত্ব করা নয়। বিক্ষোভকারীরা আফগান নারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। আফগান নারীদের প্রতিনিধিত্ব করে তারা, যারা ঘরে থেকে আফগান নাগরিকদের জন্ম দিচ্ছে এবং তাদের ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন। আফগান ক্যাবিনেটের প্রাক্তন মন্ত্রী নার্গিস নেহা এ'বিষয়ে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তার কাছে এই ঘটনা একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। তালিবানরা ক্ষমতায় এসে মহিলাদের অধিকারকে আংশিক স্বীকৃতি দেওয়ার কথা শোনালেও আসলে পরিস্থিতি ভিন্ন। ইতিমধ্যেই তারা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ডিক্রি জারি করেছে। মেয়েরা কোনও পুরুষ শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে পারবেনা। আন্দোলনকারী মহিলাদের তালিবানরা সবসময় আতঙ্কের মধ্যে রাখছে। বিরুদ্ধ মত তাদের ভীষণ অপছন্দের। তাই বিক্ষোভকারীদের কাছে প্রায়শই আসছে প্রাণনাশের হুমকি। একুশ বছর বয়সী কিশোরী চোখের কোলে জল নিয়ে বলছে, রাতারাতি তারা দিনবদলের স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাচ্ছে। তাদের হাত থেকে শিক্ষার অধিকারটুকুও চলে যাচ্ছে। তালিবানদের শাসনে মেয়েদের ভবিষ্যৎ যেন কোনও নিকষ কালো অন্ধকারে রোজ একটু একটু করে ডুবছে!

সিদ্দিক বার্মাক ২০০৩ সালে 'ওসামা' নামক একটি ছবি পরিচালনা করেন। এক কিশোরীকে ঘিরে ছবির কাহিনী। বাবা যুদ্ধে মারা গ্যাছে। দিদা আর মা তাকে ছেলে সাজিয়ে বাধ্য হয়ে কাজে পাঠায়। মেয়েটি ছদ্মবেশে তালিবানদের ডেরায় ইসলামিক শিক্ষা ও সামরিক প্রস্তুতি নিতে যায়। সেইসময় তার এক কিশোর বন্ধু তার নাম দেয় 'ওসামা'। সে, ওসামার জীবনের গোপনীয় সত্য, শিবিরের অন্য সকলের থেকে লুকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিছু সময় বিপদের মুখে প্রকৃত বন্ধুর মতো সে ওসামার পাশে দাঁড়ায়, কাঁধ এগিয়ে দেয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়না। ওসামা তালিবানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। বন্ধু, এসপ্যান্ডির হতাশ মুখে চলে যাবার মুখ দর্শকদের জানান দেয় ওসামার আগামীদিনের ভবিষ্যতের রূপ! ক্যাম্পে ওসামাকে শাস্তি দেওয়া হয়। তালিবানরা তাকে দড়ি বেঁধে কুয়োর ভেতর ঝুলিয়ে রেখে দেয়। কান্নায় ফেটে পড়ে ওসামা। যখন তাকে কুয়ো থেকে তোলা হল, তার পা ভেসে গ্যাছে ঋতুস্রাবের রক্তে। এই অপরাধ মৃত্যুদন্ডের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু, বিচারের দিন জনৈক ষাটোর্ধ বৃদ্ধ এসে বিচারকের কাছে ওসামাকে বিয়ে করার প্রস্তাব রাখে। ঘোষণা হয় ওসামার শাস্তি মকুব করা হয়েছে। সেই যাত্রায় ওসামা প্রাণে বেঁচে যায়। বুড়ো লোকটি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলে লোকটির এক স্ত্রী ওসামাকে তার নিয়তির গল্প শোনায়। লোকটি যে কতখানি নিষ্ঠুর, ক্রুর, সে'কথা ওসামা জেনে যায়! সেই রাতে উপহার হিসেবে বেশ বড়সড় আকারের একটা তালা ওসামার হাতে তুলে দেয় ওসামার জীবনের সেই বৃদ্ধ রক্ষাকর্তা। এর চেয়ে বড় উপহাস এই কিশোরীর জীবনে আর কী হতে পারে! ১৯৯৬ সালে এই ছবি যখন আফগানিস্তানে শ্যুট করা হয়েছে,

সেইসময় তালিবানরা সিনেমা তৈরী করার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ'-তেও আফগান নারীদের আসল ছবি জ্বলজ্বল করে। সুস্মিতা ছিল হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। সে ভালবেসেছিল জাম্বাজকে। জাম্বাজ ছিল ভিনদেশি মুসলিম যুবক। পরিবারের অমতে ভারতীয় হিন্দু তরুণী জাম্বাজকে বিয়ে করে পাড়ি দেয় আফগানিস্তান, তার শ্বশুরবাড়ির পথে। সেখানে গিয়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। যার হাত ধরে সে অতদূর গেল, সেই স্বামী তাকে ছেড়ে ভারতে চলে আসে। কলকাতা থেকে যাওয়া মা-বাবার স্নেহের ছায়ায় থাকা মেয়ে সুস্মিতার উপর চলে অকথ্য অত্যাচার। উপন্যাসের শুরুতেই কয়েক কথার মাধ্যমে লেখিকা বুঝিয়ে দিয়েছেন তার ভয়ার্ত পরিস্থিতির কথা–"ছ'বছর হয়ে গেল, আমি আফগানিস্তানে। এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি। দেশে ফেরার ইচ্ছেটাকে মনের ভেতর দমিয়ে রেখে পড়ে আছি এই অচেনা, রুক্ষ পাহাড়ি দেশে। কারণ, এরা আমাকে বন্দী করেছে। তবে, বন্দী করার যে আক্ষরিক অর্থ, ঠিক সেই অর্থে এখানে কাউকে বন্দী করার দরকারই হয়না। এদেশে মহিলারা একা এক পা-ও, যেতে পারেনা। সব জায়গাতেই তালিবান প্রহরীদের কড়া নজর।" এই বাধা-বিপত্তির মধ্যে থেকে সুস্মিতার দিন কাটে। সে সমস্তরকম চেষ্টা চালায়, তার ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এদেশে ফেরার! তবে, এই গল্পেও লাস্ট মোমেন্টের ক্লাইম্যাক্সে কোনও ম্যাজিক চোখে পড়েনা। সুস্মিতা ভারতে ফেরে ঠিকই, কিন্তু তার মেয়ে পড়ে থাকে আফগানিস্তানের রুক্ষ ধূ ধূ প্রান্তরে, তালিবানদের কবলে।

অর্থাৎ, তালিবানদের শাসনকালে মহিলাদের দুর্দশার অন্ত নেই। তবু, এত প্রতিকূল পরিবেশেও মহিলারা জোট বেঁধেছে। আফগান নারীরা স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার চায়। দীর্ঘদিন ধরে তারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছে। ১৯৭৭ সালে মীনা এবং আফগানিস্তানের অন্যান্য প্রতিবাদী মহিলারা মিলে প্রতিষ্ঠা করে রেভলুশনারি অ্যাসোসিয়েশন অফ উইমেন অফ আফগানিস্তান (RAWA), আফগানিস্তানের মহিলাদের বিপ্লবী সংগঠন। মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করে বর্তমানে এটি একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই সংগঠনের মহিলারা আজও আফগানিস্তানকে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রাতিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রাওয়া'র প্রতিষ্ঠাত্রী মীনাকে মাত্র ৩০ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে আফগান মেয়েরা নিজেদের অসহায়তার কথা বলেছে। মিডিয়ার সামনে বসে ১৮ বছরের মেয়ে মুমতাজ বলে, বিয়ের প্রস্তাব খারিজ করায় তাকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিল তার হবু স্বামী। এভাবে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরে মহিলাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া নাকি সেখানকার সবচেয়ে সহজ এবং চলতি পদ্ধতি! পুরুষের উপর কথা বলা এবং ভিন্ন মত প্রদর্শনের পরিণতির চিত্র। মুমতাজ সরল। সে পরজন্মে বিশ্বাসী। মুমতাজ চায় পরজন্মে পড়াশোনা করতে। আর তার ইচ্ছে পেশায় সে আইনজীবী হবে। মুমতাজ চায় নিপীড়িত মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে, যাতে আর কোনও মেয়ের জীবন তার মতো আয়নার সামনে থমকে না যায়!

তালিবানদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় তালিবানরা মহিলাদের বিষয় কী কী ফতেয়া জারি করল, তার একটা লিস্ট ঘুরতে থাকে। সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, মেয়েরা স্বামী অথবা রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কাউকে ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবেনা, বোরখা-হিজাব পরা বাধ্যতামূলক, উঁচু গলায় কথা বলা যাবেনা, হিল তোলা জুতো পরা যাবেনা, বাড়ির বারান্দায় পা দেওয়া যাবেনা, রেডিও-টেলিভিশন-প্রকাশ্য জমায়েতে উপস্থিত থাকা যাবেনা। কোথাও মহিলাদের ছবি রাখা যাবেনা। ক্যামেরার সামনে পর্যন্ত দাঁড়াবে না মহিলারা। আমরা দেখেছি, এই এত এত না-পারা নিয়ে আশেপাশের সকলে হা-হুতাশ করেছে। এদেশের

মেয়েরা আফগান নারীদের সাহসকে, তাদের লড়াইকে সংহতি জানিয়েছে। এখানে বসে আজকের দিনে আফগানিস্তানের নাম নিতে গেলে তার আগে 'সুদূর' বসাতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশ ভারতবর্ষ? এই যে, যেখানে আমাদের মাটি, আমাদের বেড়ে ওঠা, সেখানে মহিলাদের সুরক্ষা - নিরাপত্তার ছবিটা ঠিক কেমন? আসুন, একঝলকে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা আমরা মনে করি।

আন্তর্জাতিক সূচকে মহিলাদের নিরাপত্তায় ভারতের স্থান ১৩৩। আফগানিস্তান আছে ১৬৬ নম্বরে। এটুকুই তো দূরত্ব! ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP), রাষ্ট্র সংঘ সমিতি (RSS)-এর শাখা সংগঠন। আরএসএস হিন্দুত্ববাদী দল। বিজেপি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর জন্য অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে উদগ্রীব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে সাংবাদিক নেহা দিক্ষিত আউটলুক ম্যাগাজিনে একটি আর্টিকেল লিখেছিলেন। প্রবন্ধের হেডলাইন ছিল 'হোলিয়ার দ্যান কাউ'। আরএসএস-এর মহিলা শাখা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির এক সেবিকার কাছে সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, গার্হস্থ হিংসাকে কীভাবে দেখা উচিৎ বলে আদর্শগত জায়গা থেকে তিনি মনে করেন? উত্তরে সেবিকা জানান, অভিভাবকরা ছোট থেকে সন্তানদের শাসন করেন। তাই স্বামীরা স্ত্রী'র গায়ে হাত তুলতেই পারে। তদুপরি, মেয়েদের উচিৎ সংযত থাকা, স্বামীকে কোনওভাবে বিরক্ত না করা! কিছু জায়গায় মানিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ, মেয়েদের উঁচু গলায় কথা বলা যাবেনা। ভিন্নমত পোষণ করা যাবেনা। যেকোনও মৌলবাদী দলের এটাই আসল রূপ।

বিজেপি ভারতের সংবিধানকে মানেনা। তারা মনুবাদী শাসন চায়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়। দিকে দিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদের বীজ বপন করে। কাশ্মীরে কাঠুয়ার এক মন্দিরে সাত দিন ধরে আট বছরের নাবালিকা, আসিফা-কে আটকে রেখে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়। আসিফা ছিল গুজ্জার জনগোষ্ঠীর মেয়ে। গুজ্জাররা কাশ্মীরের সবচেয়ে অচ্ছুৎ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। বিজেপি'র দু'জন মন্ত্রী তখন ধর্ষকদের পক্ষে মিছিল সংগঠিত করে। একই সময়, উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে আরেক কিশোরীর ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বিজেপি'র বিধায়ক কুলদীপ সিঙ্গারের দিকে। নাবালিকাকে ধর্ষণ-কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার পরেও কুলদীপকে দলের বিধায়ক হিসেবেই রেখেছিল বিজেপি। ধর্ষিতার বাবাকে পুলিশ হেফাজতে খুন করা হয়। উত্তরপ্রদেশের আরও একটি ছোট গ্রাম, হাথরাস। হাথরাসের এক দলিত কিশোরীকে নৃশংসভাবে গণধর্ষণ করে জিভ কেটে নেয় চার উচ্চবর্ণের যুবক। পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা সেখানে প্রতিবারের মতো অভিযুক্তদের অনুকূলেরি ছিল। রাতারাতি নির্যাতিতার মৃতদেহ পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয় পুলিশ। প্রমাণ লোপাটের তাগিদখানা বুঝুন! শোষণহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা মহিলারা নির্ভয়ার ঘটনায় আট বছর আগে দিল্লিতে চলন্ত বাসে একজন প্যারামেডিক্যাল ছাত্রীর গণধর্ষণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন বিক্ষোভ জানিয়েছিল। কাঠুয়া-উন্নাও-হাথরাস; সমস্ত অত্যাচারের ঘটনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে ভারতবর্ষের মহিলারা। বিজেপি'র নেতা-মন্ত্রীরা বিভিন্ন সভায় বারংবার, বিশেষত ভোটের প্রচারে কী নিকৃষ্ট মহিলাবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন! তাদের কাছে মহিলারা কেবলমাত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্র। তাদের কোনও মতামত থাকতে পারেনা। তালিবানদের কাছেও ঠিক যেমন...! বিজেপি NRC-CAA-NPR চালু করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াতে চাইলে আমরা দেখেছি একদম প্রান্তিক অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে। আন্দোলন চলেছে শাহীনবাগ থেকে পার্কসার্কাসে। কলকাতা থেকে দিল্লিতে। যারা এতদিন আগল-আড়ালে থেকে ঘর-সংসার সামলাতো, তারাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। ছোট ছোট শিশু নিয়ে রাত জেগেছে মহিলারা। বসুন্ধরা সেদিন আলোয় আলোকিত। সিএএ-এর মতো সংবিধান বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার অপরাধে ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার ইউএপিএ আইন চাপিয়ে একাধিক মহিলার গায়ে 'দেশদ্রোহী'র তকমা এঁটে দিয়েছে। সফুরা, দেবাঙ্গনা, নাতাশা-দের মতো লাখো লাখো মেয়ে ঘরে-বাইরে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

আজ আরও একবার বিজেপি-আরএসএস-এর সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প ছড়ানোর ষড়যন্ত্রকে আমাদের রুখে দেওয়ার দিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আফগানিস্তানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা-কর্মীরা অত্যন্ত নোংরা কায়দায় ধর্মীয় মেরুকরণের খেলায় মেতেছে। তারা দেশের সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাতে শুরু করেছে। তাদের কথানুযায়ী, তালিবান মাত্রই মুসলিম। অতএব, তারা ভারতীয় মুসলমানদের দেশবাসীর সামনে তালিবানদের মতো নিষ্ঠুর, ভয়ানক, অনুন্নত, ত্রাসসৃষ্টিকারী সম্প্রদায় হিসেবে তুলে ধরার ঘৃণ্য চেষ্টা চালাচ্ছে। যার মাধ্যমে

বিজেপি'র এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফাঁদে পা দেওয়া সকলের মনে মুসলিম-বিদ্বেষ চরমে পৌঁছোবে। সম্প্রতি, আমরা অসমের ঘটনা দেখেছি। বাঙালি-মুসলিম যুবকের গুলিবিদ্ধ বুক থেকে রক্ত ঝরতে দেখেছি। মাটিতে পড়ে যখন সে কাঁপছে, শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তখন অসম পুলিশের দালাল, জনৈক সাংবাদিকের নৃশংস আচরণ দেখেছি। মৃত মানুষের উপর চলেছে লাথি-ঘুষি। ধর্মে মুসলিম হওয়ার দরুন এ'দেশে মানুষ মব লিঞ্চিং-এর শিকার হয়। আফরাজুল, শাহরুখ, আখলাখ, পেহলু-দের মৃত্যু হয়। তাই, তালিবানি সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করে যাতে বিজেপি-আরএসএস কোনওরকম অপপ্রচার না চালাতে পারে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করা গণতান্ত্রিক দেশের সুনাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের অত্যাবশ্যক কর্তব্য হওয়া প্রয়োজন।

নয়া কৃষি আইনের বিরোধিতা করে দিল্লির উত্তর প্রান্ত জুড়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার গ্রাম থেকে উঠে আসা হাজার হাজার কৃষক এখন রাজপথের দখল নিয়েছে। 'দাবি একটাই, কৃষি আইন স্থগিত নয়, বাতিল চাই।' আন্দোলনে সামিল হয়েছে বিপুল সংখ্যক মহিলা। গ্রামীণ ভারতের ৬৫ শতাংশ মহিলার মতোই (জনগণনা ২০১১) তাঁর পরিবারের মহিলারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাষের কাজে যুক্ত। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ জমির মালিক নন কিন্তু চাষবাসে তাঁরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন –বীজ বোনা, চারা প্রতিস্থাপন করা, ফসল কাটা এবং ঝাড়াই, খেত থেকে ফসল বাড়ি নিয়ে যাওয়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পশুপালন ইত্যাদি আরও অনেক কিছু তাঁরাই সম্পন্ন করেন। তৎসত্ত্বেও, ১১ই জানুয়ারি উচ্চ ন্যায়ালয় যখন তিনটি কৃষি আইন স্থগিত ঘোষণা করে তখন প্রধান বিচারপতি বলেন যে বয়োজ্যেষ্ঠদের এবং মহিলাদের আন্দোলনস্থল থেকে চলে যেতে 'রাজি করানো' উচিৎ। তারপরেও, মহিলারা রাস্তায় থেকেছে। নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-দলিত-আদিবাসী; সকল মানবজাতির দাবিদাওয়া নিয়ে তারা মাঠে-ময়দানে লড়াই-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন।

সিরিয়া ও ইরাকে কুর্দি ওয়ার্কার্স পার্টির মহিলারা ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (ISIS) জঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে। তারা মনে করেন, দেশ ততক্ষণ স্বাধীনতা পায়না, যতক্ষণ না দেশের মহিলারা স্বাধীন হয়। পশ্চিম এশিয়ার অগণতান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক অঞ্চলের মাঝে কুর্দ মহিলাদের জনপ্রিয় স্লোগান 'জিন, জিয়ন, আজাদী'। এর আক্ষরিক অর্থ 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা'। রোজাভা এলাকায় সমাজতন্ত্রী নারীবাদী স্বশাসিত এলাকা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সেখানকার মহিলারা একজোট হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করছেন। ফ্যালোসেন্ট্রিক (পুংলিঙ্গ কেন্দ্রিক) সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে ও লিঙ্গবৈষম্যকে সমাজ থেকে মুছে ফেলতে তারা তৎপর। এই কুর্দি মহিলারা আফগান নারীর দুর্দিনে তাদের আরও বেশি কাছে টেনে নিয়েছেন। কুর্দি নারী, আফগান বোনদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছেন। বার্তা দিয়েছেন– সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, খুনি এই তালিবান শাসকদের হাত থেকে আফগান মেয়েদের মুক্তির পথে কুর্দি বোনেরা প্রতি পদে ভালবেসে তাদের পাশে থাকবে। সুখ-দুঃখ-কান্না তারা পরস্পর ভাগ করে নেবে। বিক্ষোভে পথে নামলে সংহতি জানাবে।

এভাবেই গোটা বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সামনের সারিতে সামিল হওয়া সমস্ত জাত-ধর্ম-বর্ণের মহিলারা, সমগ্র নারীসমাজকে নয়া দিশা দেখাচ্ছে। রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে আরও দৃঢ় করার মন্ত্র তারাই প্রত্যেকের কানে পৌঁছে দিচ্ছে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, মহিলাদের উপর লাগাতার অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। ইতিহাস বলছে, দমন-পীড়ন যত বেশি জোরদার হয়েছে, বিশ্বব্যাপী মহিলাদের স্বাধিকারের লড়াইয়ের স্লোগান তত দৃপ্ত হয়েছে। তবে আফগান নারীরা অধিকার ছিনিয়ে নিতে কেন পারবেনা? ভারত, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া– সর্বত্র নারীমুক্তির আন্দোলন নিশ্চিতভাবে সফল হবে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের সাথে মহিলাদের আদিকাল থেকে বিরোধ। তাই, আপোষে নয়, আস্থা থাকুক প্রতিরোধে।

-ত্রিয়াশা লাহিড়ী (আইসা কর্মী)

■ আফগানিস্তানে তালিবানি শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এআইএসএ-র। বুধবার মৌলালিতে। *নিজস্ব চিত্র*

সিলেবাসে কাঁচি, ভাবনায় ফ্যাসিবাদের থাবা

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস থেকে বাদ পড়লো মহাশ্বেতা দেবীর ছোটো গল্প 'দ্রৌপদী', বাদ পড়লো তামিল দলিত সাহিত্যিক বামা ও সুকীর্থরানীর লেখাও। গত এক সপ্তাহে অনলাইন নিউজ পোর্টালে পড়লাম বেশ কয়েকটা খবর; একটি ১৩ বছরের দলিত মেয়েকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দু'বার ধর্ষণ করা হয়েছে দিল্লির সঙ্গমবিহারে, কর্নাটকে এক দলিত মহিলাকে মারধোর করা হয়েছে গ্রামের টিউবওয়েল থেকে জল তোলার জন্যে, সেই কর্নাটকেই একটি দুই বছর বয়সী দলিত মেয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়ায় তার পরিবারকে ২৫০০০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়েছে, তেলেঙ্গানায় গত দুই বছর ধরে একটি দলিত পরিবারকে শৌচাগারে বসবাস করতে বাধ্য করা হচ্ছিলো, যা ঘটনাচক্রে এতদিন পরে সর্বসমক্ষে এসেছে এবং ইত্যাদি প্রভৃতি আরো কত কী!

উপরের ঘটনাপ্রবাহগুলি ভিন্ন; প্রথমটা আপাত নিরীহ, শুনলে মনে হবে উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের খানিক এলিট সমস্যা। আর পরেরগুলো প্রথমটার চেয়ে একেবারে একটা ভিন্ন মেরুর মানুষদের, যাদের কাছে নিত্যদিনের বেঁচে থাকাটাই ঝঞ্ঝাসংকুল। যেখানে মিল এই ঘটনাগুলোর, তা হলো এদের আড়ালে থাকা উদ্দেশ্যের। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মনুসংহিতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার এই প্রচেষ্টা ফ্যাসিবাদী সরকার চালিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। বিজেপির ঊর্ধ্বতন নেতা থেকে শুরু করে নিচুতলার কর্মী সমর্থক ছাড়াও যে বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে তারা সাম্প্রদায়িকতা, নারীবিদ্বেষ, জাতিভেদের বিষ প্রয়োগ করতে সফল হয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে যাদের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে; এসব প্রকাশ্য মারধোর, নির্যাতন, জরিমানার মতন ঘটনাগুলো তাদেরই মনস্তত্ত্ব অভিযোজনের ফলাফল। আর যেসব রাঘব-বোয়ালরা এই সোসাইটি-পিরামিডের মাথায় বসে আছে, তারা রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কাটাছেঁড়া করার জন্যে। এইরকমই এক এক্সপেরিমেন্টের অংশ হিসেবে কাঁচি পড়েছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে। এই এক্সপেরিমেন্টের অংশ হিসেবেই সাভারকর-গোয়ালকররা পাঠ্যক্রমে ঢুকে পড়ার লাইসেন্স পেয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশের ইঞ্জিনিয়ারিঙয়ের সিলেবাসে যুক্ত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারত। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্রের পাঠ।

এক হাতে দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘু-নারী-পুরুষদের দীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ইতিহাসকে মুছে ফেলা, অন্য হাতে যাবতীয় বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যকে কার্যত নস্যাৎ করে প্রগতিবিরোধী ভাবধারাকে আরো বেশি স্বাভাবিক করে তোলা মূলত এই দুইভাবেই বিজেপি শিক্ষার গৈরিকীকরন করতে সফল হচ্ছে। যা কিছু বাদ পড়ছে, তার সবকিছুই এই সরকারের ভাবমূর্তির বিপ্রতীপে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহাশ্বেতার 'দ্রৌপদী' ওরফে 'দোপদি মেজেন' তার সফলতম উদাহরণ। মাত্র ছয়-সাত পাতার ছোট গল্পটি এক স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র এবং তার যুদ্ধোদ্যত সৈন্যবাহিনীর বুকে কাঁপন ধরাতে সক্ষম। গল্পের প্রেক্ষাপট সত্তর দশকের, প্রধান চরিত্র দোপদি নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত এক আদিবাসী রমণী। সেনার হাতে তার স্বামীর এনকাউন্টারের পর দোপদির মাথার উপরেও দাম ধার্য হয়, এরপর ঘটনাচক্রে সেও ধরা পড়ে এবং বিদ্রোহের 'শাস্তিস্বরূপ' তাকে শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়। কিন্তু গল্পের শেষ এখানে নয়। তেমনটা হলে হয়তো আর সিলেবাসে কাঁচি পড়ত না। এরপর পরদিন সকালে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে দোপদির ঘুম ভাঙ্গে, চরম ঘেন্নায় সে তার পরনের বাকি পোশাকটুকুও দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে এবং সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তার ধর্ষকের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার যে নগ্ন শরীরকে গত রাত্রে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের পোষা কুকুরেরা, আজ তার সেই নগ্নতার সামনে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ভয় পায়। দোপদির এই নগ্ন শরীর তখন যৌনতারও নয়, পবিত্রতারও নয়, এই নগ্নতা তখন এক

শোষিত নারীর প্রতিরোধের অস্ত্র। এই নগ্নতা তাই এত বছর পরেও একই ভয় ধরাতে পেরেছে রাষ্ট্রের ঘুণ-ধরা অন্তরাত্মায়। ফ্যাসিবাদ নিজেকে ওই ধর্ষক সেনানায়কের জায়গায় বসিয়ে দেখেছে, আর তার সামনে রক্তে ভেজা উরু, যোনি, বক্ষদেশ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মণিপুরের থাঙ্গাম মনোরমা, হাথরাসের মনীষা বাল্মীকি, কাঠুয়ার আসিফা; দোপদির গগনভেদী হাসির স্বরে ধ্বনিত হয়েছে হাজার হাজার মনিপুর, কাশ্মীর, কুনান-পোশপোরার মেয়েদের প্রতিরোধ - 'ইন্ডিয়ান আর্মি রেপ আস', শাসক ভয় পেয়েছে। ধর্ষিতা নারীর এমন অদ্ভুত আচরণের কথা তো তাদের রুলবুক অর্থাৎ মনুস্মৃতিতে কদাপি লেখা নেই! তার উপর আবার আদিবাসী নারী! তার উপর আবার নকশাল! অতএব প্রতিরোধ প্রতিবাদ? নৈব নৈব চ! মনে পড়ে যায়, কিছুদিন আগেই রাজনৈতিক মানবাধিকার কর্মী নৌদীপ কৌর যেদিন জেল থেকে ছাড়া পেলেন, সংবাদমাধ্যমে বাইট দিতে গিয়ে তিনি বলছিলেন কীভাবে জেলের মধ্যে পুলিশ কর্মীরা বারংবার তার দলিত পরিচয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কাজ উচ্চবর্ণের মলমূত্র পরিষ্কার করা, অ্যাকটিভিজম নয়।

এ'বার এই গল্পটা কেনো বাদ পড়েছে তা সহজেই অনুমেয় নিশ্চয়ই? এই প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সমালোচকদের নিন্দা বিক্ষোভের মুখে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় সাফাই দিয়েছে, যে এই গল্পে নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে খারাপ ভাবে দেখানো হয়েছে। এইটুকুই কারন। এখন অনেকে প্রতিযুক্তি সাজাতে পারেন, যে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়লেও ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসেই অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করে গল্পটা পড়ে নিতে পারেন। তার উত্তর– হ্যাঁ অবশ্যই পারে, কিন্তু সাহিত্যের যে 'ক্যানোনাইজেশন'-এর মাধ্যমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম নির্বাচন করা হয়, সেখান থেকে একটা দুটো গল্প উপন্যাসকে বাদ দিয়ে দেওয়া কি ইতিহাস পুনর্লিখনের স্বতঃপ্রণোদিত প্রচেষ্টা নয়? সাহিত্য তো সমাজের দর্পণ! তার দেহ থেকে টিকে থাকার লড়াই, লিঙ্গরাজনীতি, শোষন ও প্রতিসংগ্রামের ইতিহাসকে এভাবে ছেঁটে ফেলা হলে তার অবশিষ্টাংশ তো রামের ইঞ্জিনিয়ারিং আর 'বীর' সাভারকারের দেশপ্রেমের মতনই দেখাবে– একটা মস্ত বড় শূণ্যের মতন! আর শাসকদল ঠিক তাই-ই চাইছে। সেইজন্যেই পড়ুয়াদের কাছে স্কুল-কলেজ সুলভ না হলেও, তাদের সিলেবাসের গৈরিকীকরনে কিংবা বিনা বাধায় নয়া শিক্ষানীতি চাপিয়ে দিতে কোনো খামতি নেই। চিরশোষিত, দুর্বিনীত মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পকে তাই এই সরকার ছাত্রসমাজের নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দিতে চায়, তাদের মস্তিষ্কে থাবা বসায়, নিপীড়িতের টুঁটি টিপে ধরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। সমাজের মূলপ্রবাহ থেকে আরো আরো দূরে, শোষণের নাগপাশে এমন করে বেঁধে ফেলতে চায় যাতে কোনোদিন আওয়াজ তোলার, কলম চালানোর বা গান বাঁধার সুযোগই সে আর না পায়!

কিন্তু ছাত্রসমাজ যে রুখে দাঁড়াবেই! ঠিক যেমন গ্যালিলিওকে বন্দী করে ধর্মভীরুর দল প্রমাণ করতে পারেনি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, ঠিক তেমন করেই আজ একজন মহাশ্বেতার আখ্যান নির্মূল করতে চাইলে রক্তবীজের মতন লক্ষ লক্ষ মহাশ্বেতা আর তার দ্রৌপদী জন্ম নেবে। দ্রৌপদীররা হয়ে উঠবে সেই অপরাজেয় নারী, যাদেরকে বিজেপি-আরএসএস'এর আদর্শ বা মনুবাদ পুড়িয়ে ফেলতে পারবে না। শিক্ষা কোনও পণ্য নয়, আর তাকে গেরুয়া রং-ও দেওয়া যাবেনা। দ্রৌপদীর শেষ হাসির জন্যে প্রস্তুত হও!

-উপমা মুখার্জি (আইসা কর্মী)

'দ্রৌপদি ইজ অ্যাপ্রিহেন্ডেড বাট নেভার ডেসট্রয়েড' – দ্রৌপদীদের মৃত্যু নেই

সম্প্রতি দিল্লী ইউনিভার্সিটির ইংরাজি স্নাতকের সিলেবাস থেকে একটি ছোট অনুবাদ গল্প দ্রৌপদি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গল্পের লেখিকা এবং অনুবাদক যথাক্রমে মহাশ্বেতা দেবী এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এই ছোটো গল্প হঠাৎ হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের বশংবদ কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠলো কেন? নাকি নিছকই সিলেবাসের প্রতুলতা কমাতে এই ব্যবস্থা? তাঁদের মতে, এই গল্পে বর্ণিত ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের চোখে ভারতীয়

সেনার মর্যাদাহানির পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের অস্বাচ্ছন্দ্যে ফেলবে। এই একই অজুহাতে বামা, সুকীর্থণীয়ার মতো দলিত লেখিকারাও বাদ পড়ে যাচ্ছেন সিলেবাস থেকে। তাই, নিছক বৃহৎ সিলেবাসের বোঝা কমানোর জন্য যে এই ব্যবস্থা নয় তা বলাই বাহুল্য।

গল্পের কথায় আসা যাক। একাত্তরে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ, অপারেশন বাকুলি এবং অপারেশন ঝাড়খনি, এই হলো মূল গল্পের পটভূমি। দোপ্ দি মেঝেন এবং দুলন্ মাঝি পুলিশের ভাষায় দুই কুখ্যাত রেবেল ঝাড়খন্ডের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে। তাদের ধরতে পুলিশের বিশেষ বাহিনী বহু সাঁওতাল-সাঁওতালীকেও তাদের অনিচ্ছায় সিংবোঙার কাছে পাঠিয়েছে। কারণ তাদের কাছে শুধু সাঁওতাল কেনো অস্ট্রো এশিয়াটিক গোষ্ঠীর কোনো মানুষকেই আলাদা চেহারা হিসাবে দেখার ইচ্ছে, ধৈর্য্য কোনোটিই নেই। তাছাড়া, রক্তচোষা জোতদার সূর্য সাহুকে খুন করার সময় এই গ্রামবাসীরাই তো সাহায্য করে দোপ্ দি দের দলটিকে। তাই একপ্রকার সম্পূর্ণ গ্রামে আগুন লাগিয়ে, নিরীহ প্রাণ ধ্বংস করে, বন্দুকের মেইল অর্গ্যানের সঠিক ব্যাবহার করেও যখন দোপ্ দি দুলন ধরা পড়ে না, ক্যাপ্টেন অর্জন সিংয়ের বহুমূত্র বহুমাত্রায় বেড়ে যায়। তার কালো মানুষ দেখলেই কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে টাঙি,হেঁসো, কাস্তে নিয়ে লড়াই করে ওরা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না বন্দুকের সামনে। জঙ্গলের আদিম অধিবাসীরা কেউ জল খেতে গিয়ে, কেউ কাঠ কাঠতে গিয়ে, কেউ হাইড আইটে যাওয়ার পথে অচিরেই মারা পড়ে। দ্রৌপদির মাথার দাম ধার্য হয় একশত টাকা-জীবন্ত চাই..... ক্রমশঃ পিছু হঠতে হঠতে ও টের পায় হিংস্র পশু যেমন শিকারের বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতির অপেক্ষা করে, ঠিক সেই ভাবে একপাল হায়না অপেক্ষায় রয়েছে। জলের ধারে ওরা ক্ষেপ মারে, চুলে কেরোসিন দিয়ে জলে ধুলেও সেই গন্ধে চলে আসবে ঠিক.....। এই সাঁতপাচ ভাবতে ভাবতে পেট কাপড়ে ভাত বেঁধে হাঁটতে হাঁটতেই দ্রৌপদি আওয়াজটা শুনতে পেলো। পায়ের আওয়াজ, ওর নাম ধরে ডাকছে, পিছনে আসছে, পিছু নিয়েছে। আর দ্রৌপদীর মাথায় অনেকগুলো চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ধরা পড়ে যাবে, কাউটার-কাউটার, ভীষণ যন্ত্রণা... কুলকুলি দিতে হবে, সতর্ক করতে হবে,...কেউ ভয় পাবে না...নো ইমোশন,... দুলনকে ওরা মেরে দিলো, ও তো জল খেতে গেছিলো,...একবার ও শেষ দেখা হলো না যে...!

প্রায় এক নিঁযুত চন্দ্র পরে দ্রৌপদি খোলা আকাশের নিচে, চার হাত পা বাঁধা, নগ্ন, নিজের শরীরের রক্তে মাখামাখি অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করলো। প্রথমে ভেবেছিলো বুঝি ওরা ফেলে রেখে গেছে! পাশেই খসখসানি। ওহ! একটা রাস্কেল বন্দুকের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, এখনো বানিয়ে নেওয়া শেষ হয়নি তবে! বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে থাকা একটা শরীরঅসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে আবার চোখ বুজলো।

গল্পটা এখানে শেষ হলেও হয়তো আপামর রাষ্ট্রের পদলেহনকারী কর্তৃপক্ষের সমস্যা থাকতো না। কিন্তু দ্রৌপদী পরদিন উঠে দাঁড়ালো। একটা ছিঁচকে উর্দিধারী এসে যখন ওকে স্যারের ঘরে যেতে বলল, ক্ষতবিক্ষত শরীরটা নিয়ে ও সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কাপড়টা দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো করলো, তারপর স্বাভাবিক নির্লজ্জ ভঙ্গিতে হেঁটে বাইরে এলো। ওই কালো, নগ্ন, দুর্বোধ্য, কালনাগিনীর মতো শরীর নিয়ে সেনানায়কের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, "কিরে, কেমন বানিয়েছে দেখবি নাই?" এই দ্রৌপদির লজ্জা ঢাকার জন্য একশো হাত কাপড়ের দরকার হয়না। অসংখ্য যুবককে 'অ্যাপ্রিহেনশন এন্ড এলিমিনেশন করা সেনানায়ক এক নিরস্ত্র, আহত, সাঁওতাল নারীর সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন ভয় পান, ভীষণ ভয়। হিন্দুরাষ্ট্রের ধ্বজাধারী জনকেরা এই নির্লজ্জতাকে ভয় পায়, এই কলমকে ভয় পায়। ভীত সেনানায়কের মুখের প্রতিচ্ছবি তাদের মুখে অদ্ভুতভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। তাই উন্নাও, কাঠুয়া,হাথরাস বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষকের সমর্থনে মিছিল হয়, সাফুরা জারগর-কে গর্ভবতী অবস্থায় জেলে বন্দী থাকতে হয়, গৌরি লঙ্কেশ এনকাউন্টারড হয়ে যান রাতের অন্ধকারে।

তাই এই ছোটোগল্পের বাদ পড়ে যাওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ক্রমাগত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ বিষয়ের সিলেবাসের উপর কাঁচি চালিয়ে এবং অপ্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় জুড়ে দিয়ে বিজেপি-আরএসএস ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস-ইতিহাসবিদ্, সাহিত্য- সাহিত্যিকদের কাজ ভুলিয়ে দেওয়ার দুরভিসন্ধি নিয়েই পথে নেমেছে। আমাদের এই ভুলিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করতে হবে, রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের বিরোধিতা করতে হবে, পড়তে-জানতে-মনে রাখতে হবে মহাশ্বেতা দেবীকে, বেগম রোকেয়াকে, সাবিত্রী বাঈ ফুলেকে। আর মনের ভেতর গেঁথে নিতে হবে একটা স্পষ্ট কথা- 'দ্রৌপদি মাইট বি অ্যাপ্রিহেন্ডেড বাট নেভার ডেসট্রয়েড'।

-অয়ন্তিকা বাগ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)

মুজফফরনগর আভি ভি বাকি হ্যায়

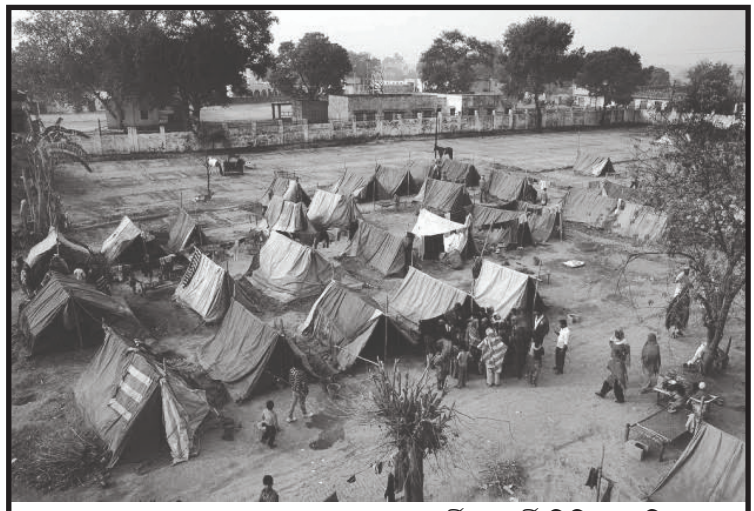

২০১৩ সালে মুজফফরনগরে দাঙ্গা পরবর্তী শরণার্থী শিবিরের ছবি

পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের নাম লোকমুখে উঠে আসে ২০১৩-এর অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কারণে। সরকারি রিপোর্ট বলে জাট সম্প্রদায়ভুক্ত এক মহিলাকে উত্যক্ত করাকে কেন্দ্র করে জাট এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বাধে এবং ২৭শে অগস্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং মহিলার দুই ভাইয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিবাদ চরমে পৌঁছোয়। ভস্মে ঘৃতাহুতি ঢালে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত একটি ভিডিও, যা পরে ফেক বলে জানানো হয়। পুলিশী বাধাসত্ত্বেও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি অবধি চলতে থাকা এই ঘটনায়, সরকারি হিসেবে, ক্ষতিগ্রস্থ মুজফফরনগর ও শামলী জেলায় ৬২ জনের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে ৪০ জনই মুসলিম।

৮ই জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে সিপিআই(এমএল) সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি দল অবস্থার পর্যবেক্ষণে যায়। এই দলে ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য কবিতা কৃষ্ণণ ও স্বপন মুখার্জী, দিল্লী প্রদেশের সম্পাদক সঞ্জয় শর্মা, এআইকেএম-এর সহসভাপতি প্রেম সিং গেহলাওয়াটের সাথে আইসা, আরওয়াইএ এবং জেএনইউ ছাত্র সংসদের নেতা-কর্মীরা।এই পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্টে জানা যায় ২০১৩ সালের ২৬শে অক্টোবর ও ২৫শে নভেম্বরে আসা দুটি সরকারি নির্দেশে মুজফফরনগর সহ ন'টি গ্রামের পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য ৯০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়। এই নির্দেশে প্রত্যেক পরিবারপিছু ৫লাখ টাকা দেওয়া হয় এবং এফিডেভিটে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে তাঁরা ভয় পেয়ে নিজেদের বসতজমি ছেড়ে গেছেন। এও বলা হয় যে, পরবর্তীতে এফিডেভিটে স্বাক্ষরকারীরা বাড়ি ফিরতে চাইলে এই টাকা যেকোনও মূল্যে তাদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে। এদের মধ্যে যেসব পরিবার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের ত্রাণক্যাম্পগুলি থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাদের ভয় দেখানো হয় যে তারা না বেরিয়ে গেলে তাদের জমির দাম তাদের থেকে ফেরত নেওয়া হবে। উপরন্তু, যেসব পরিবার দাঙ্গার পর ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, তাদের বাড়ি না ফেরার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এফিডেভিটে সই করানো হয়। ফলতঃ, পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এই দাঙ্গা কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ নয়, সরকারের মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের বাসনা থেকেই এই দাঙ্গার শুরুয়াত। সরকারি বিদ্বেষের শেষ এখানেই নয়। দাঙ্গায় নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা সরকারি হিসবের প্রায় দ্বিগুণ এবং মৃতের সংখ্যাও কমপক্ষে ১০০। তাছাড়াও মুজফফররনগর ও শামলী ছাড়াও বাঘপত ও মীরাট জেলাও প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, যা সরকারি

রিপোর্টে জানানো হয়নি। এছাড়াও দাঙ্গাক্রান্ত বহু মানুষ রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও ত্রাণ পাননি। এই পুরো এলাকা মিলিয়ে আরও প্রায় ৮০ টি গ্রামের মানুষ, যারা সশস্ত্র দাঙ্গাবাজদের ভয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, তাদের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থের স্বীকৃতি দেয়নি সরকার।

মুজফফরনগরের ক্যাম্পে শিশুমৃত্যুর ঘটনার সময় যখন মুলায়ম সিং, অখিলেশ যাদব ও তাদের পরিবার নতুন বছরের উদযাপনে ব্যস্ত, তখন সিপিআই(এমএল) ২৮-৩০শে ডিসেম্বর ত্রাণ সংগ্রহের ক্যাম্পেন নেয়। কমরেড দীপঙ্কর এই ক্যাম্পেনে ওঠা টাকা জউলা ও কান্ডহলা গ্রামের ক্যাম্পের হাতে তুলে দেন। ২৮-২৯ ডিসেম্বর সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, আইসা ও জেএনইউ ছাত্র সংসদের নেতা-কর্মীরা দাঙ্গা-বিদ্ধস্ত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পৌঁছোয়। তারা বুধানা ও জউলার দুটি ক্যাম্প এবং হুসেইনপুর ও জউলার দুটি মাদ্রাসায় ত্রাণসামগ্রী দেয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সাথে কথা বলে। এই ক্যাম্প ও মাদ্রাসায় প্রায় ৩৫০০ মানুষ তখনও আশ্রিত ছিলেন। এই ক্যাম্পগুলির অধিকাংশই দাঙ্গায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা– ফুগানা, কুতবা, খেরাগণী, ভোরকালা, লিসাধ ইত্যাদির অধিবাসী ছিলেন। দাঙ্গার এতদিন পরেও এদের স্থায়ী পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা সরকার করেনি। ক্যাম্পগুলিকেও এত মানুষের থাকার যোগ্যভাবে তৈরি করা হয়নি। উপরন্তু, চরম অব্যবস্থার কারণে ক্যাম্পগুলিতে বহু শিশুর মৃত্যুর জন্যও কুরুচিকর টিপ্পনী কাটতে দেখা গেছে সরকারি বাবুদের।

২রা জানুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচীর ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির কাছে উত্তরপ্রদেশের অবস্থায় ৩৫৫ ধারার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবী করা হয়। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষরা যাতে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও ন্যায়বিচার পান তারও দাবী জানানো হয়। পাটনায় শোষিত সমাজ দল এবং ভারতীয় মোমিন ফ্রন্টের সাথে সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিরোধী বিলের দাবীতে ধর্ণা দেওয়া হয়। আইসা নেতা শ্বেতা, ফারহান, আরওয়াইএ সাধারণ সম্পাদক রবি রায় ও নেতা আসলাম, জেএনইউ ছাত্রসংসদের প্রেসিডেন্ট ও সহ সভাপতি আকবর ও সরফরাজসহ বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই ধর্ণায় অংশগ্রহণ করে। উত্তরপ্রদেশের লখনৌ ও রবার্টসগঞ্জেও প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয়, যেখানে সীতাপুর, আম্বেদকরনগর ও ফৈযাবাদের কর্মীরাও অংশ নেন। এছাড়াও মির্জাপুর, মুঘলসরাই, বেনারস, এলাহাবাদ, দেওরিয়ায় মিছিলের পরে প্রতিবাদসভা হয়। মউ, বালিয়া, ভাদোহী, জালাউন, মুরাদাবাদ সহ আরও বহু জায়গার জেলা সদরদপ্তরে দাঙ্গা-পীড়িত মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের দাবীতে প্রতিবাদ জানানো হয়। তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে কমরেড মনুস্বামী, পলিটব্যুরো সদস্য কুমারস্বামী, আরওয়াইএ নেতা ভারতীর নেতৃত্বে প্রতিবাদ হয় এবং ত্রাণসংগ্রহ করা হয়। পুদুকোট্টাই, রসীপুরম, নামাক্কল ও থিরভেল্লোরেও প্রতিবাদ হয়। উত্তরাখণ্ডের শ্রীনগর, রুদ্রপুর ও হলদওয়ানীতেও প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয়।

এই ঘটনার পর প্রায় আট বছর কেটে গেছে। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো আজও ন্যায়বিচার পায়নি। উপরন্তু, ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশ জুড়ে সরকারি মদতপুষ্ট মুসলিমবিদ্বেষের ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাম্প্রতিকতম ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর-পূর্ব দিল্লীতে। সংখ্যালঘুদের উপর রাষ্ট্রীয় শোষণের পাশাপাশি এই ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সাধারণ জনতা অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো এবং কোভিডের কারণে বিপুল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তার উপরে বিজেপি সরকারের আনা নতুন কৃষিবিল চাষিদের ও সাধারণ মানুষের এই দুর্গতিকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে চলেছে। ২০১৯-এর শেষ থেকেই পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের বিপুল সংখ্যক চাষি দিল্লীর রাস্তায় বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকারকে এই বিল ফেরত নেওয়ার জন্য বাধ্য করতে বদ্ধপরিকর। ২০২২-এ উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সরকারের নির্বাচনের ঠিক আগে এই রাজ্যের কৃষকসমাজ এবং বৃহত্তর জনতার ঐক্য সারা দেশের মানুষকে দিশা দেখাচ্ছে। এর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় প্রকাশ ঘটেছে মুজফফরনগরের মহাপঞ্চায়েতে। এক লাখের বেশি চাষি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র মোদী ও যোগী সরকারের তিনটি কৃষি বিলের বিরোধিতা করেননি, অথবা কেবলমাত্র হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের চাষিদের ওপর হওয়া সরকারি সন্ত্রাসের বিরোধিতাই করেননি, তারা সামগ্রিকভাবে মোদী-যোগী শাসনের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের রাজনীতি ও তার সাহায্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় আসার চেষ্টারও সম্পূর্ণ বিরোধ জানিয়েছেন। চাষিদের প্রতিবাদের এই আহবানে সাড়া দিয়েছেন দেশের মজদুর, শিক্ষক, ছাত্রগছাত্রী, চাকুরীজীবী ও পেনশনভোগীরা। যোগীর রাজ্যসরকার ১০০০০ কোটি টাকা শিক্ষক ও চাকুরীজীবীদের ভাতার টাকা থেকে চুরি করেছে। শিক্ষামিত্রদের বেতন ৪৫০০০ থেকে কমিয়ে ১০০০০ করার ফলে আত্মহত্যা

করেছেন বহু শিক্ষক। মহাত্মা কস্তুরবা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ২০০০ এরও বেশি শিক্ষককে ছাঁটাই করেছে যোগী সরকার। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের নির্বাচনের ডিউটি করার কারণে মৃত্যু হয়েছে বহু শিক্ষকের। উত্তরপ্রদেশের যুবসম্প্রদায় যোগী সরকারের প্রবল বিরোধ করেছে। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্টে কোভিডের আগেই চাকরিহীনতার হার প্রায় ২৪%। উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সরকার এর নিরাময়ের জন্য তো কিছু করেনি। বরং ভুল তথ্য দেখিয়ে এই অবস্থাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। দুর্নীতিহীন রাজ্যসরকারের রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে ফাঁকা স্থানগুলি কেন পূরণ হচ্ছেনা সেই প্রশ্নে যুবদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরাও। পুলিশ দপ্তরেই ফাঁকা রয়েছে ১ লাখের ওপর আসন। কস্তুরবা গান্ধী স্কুলের ফাণ্ডের ৯ কোটি টাকা এদিকওদিকের অভিযোগ এনেছেন নিম্নশিক্ষা পর্ষদের ডিরেক্টর জেনারেল স্বয়ং। কিং জর্জ মেডিক্যাল কলেজ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যপরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে দুর্নীতি চরমে, এমনকি কোভিডের কিটেও দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় বিজেপি সাংসদের পুত্র স্বয়ং।

যোগীর রাজ্যে 'দুর্নীতির প্রতি অসিহিষ্ণুতা'র থেকেও বেশি হাস্যকর হয়ে উঠেছে 'অপরাধের প্রতি অসিহিষ্ণুতা'র স্লোগান। হিংসাত্মক জনতার হাতে মুসলিম ও দলিত হত্যা এবং ধর্ষণ এই রাজ্যজুড়েই রোজনামচা হয়ে উঠেছে। হাথ্রাসের ঘটনার পর এক বছরেরও বেশি কেটে গেছে, কিন্তু নির্যাতিতার পরিবার ন্যায় তো দূরে থাক, সরকারের প্রতিশ্রুতি মত ক্ষতিপূরণ, চাকরি ও বাড়ি কিছুই পায়নি। মহিলাদের উপর নির্যাতনে দেশে রাজস্থানের পরেই দ্বিতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ। মহামারির সময়ে বাড়ির মধ্যে মহিলাদের ওপর নির্যাতন অনেক গুণ বেড়ে গেছে, কিন্তু পুলিশের কাছে না পৌঁছোনোকে কাজে লাগিয়ে এই তথ্যেও গুপি করে চলেছে সরকার। এনসিআরবি থেকে পাওয়া তথ্যই বলছে অপরাধের ক্ষেত্রে দেশে চতুর্থ স্থানে উত্তরপ্রদেশ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেও সবথেকে পিছিয়ে এই রাজ্য। সশস্ত্র সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতিতে এত বেশি অপরাধ আর কোন রাজ্যে হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে অদলবদল হলেও বদল হয়নি সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন ছড়িয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট হিংসার।

মুজফফরনগর-শামলী থেকে উত্তরপূর্ব দিল্লীর সীলামপুর-জাফরাবাদ হয়ে হাথ্রাস পর্যন্ত প্রত্যেক ঘটনায় রাষ্ট্র পূর্ণ মদত দিয়ে এসেছে। কিন্তু, মুজফফরনগরের কিষাণ মহাপঞ্চায়েতসহ সারা উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় চাষিদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ বিদ্বেষের রাজনীতিকে প্রথম শনাক্ত করতে পেরেছেন। তাই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ পিছনে ফেলে সম্মানজনক জীবন-জীবিকার দাবী করছেন সরকারের কাছে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, যাকে বিজেপি নিজের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রাজনীতির মূল ল্যাবরেটরি বানাতে চেয়েছিল, সেখানকারই চাষিরা দেশজুড়ে আন্দোলনের এক নতুন দিকনির্দেশ করছেন।

২০১৩ সালের দাঙ্গা থেকে বেরিয়ে এসে মুজফফরনগরই ভারতের আপামর গণতান্ত্রিক মানুষকে এই মুসলিম, দলিত, নারী, যুব, কৃষক, শ্রমিক এবং গণতন্ত্র বিরোধী বিজেপি সরকার ও সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দিকনির্দেশ করছে। সুতরাং, সবশেষে বলা যায়, মুজফফরনগর আভি ভি বাকি হ্যায়!

-কৌশিকী ভট্টাচার্য (আইসা কর্মী)

ক্যাম্পাস খোলা চাই

(প্রথম পাতার পর)

পেপার প্রেশেন্টেশন হয়ে চলেছে। যে দেশে ফোন কিনে দিতে না পারার জন্য স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ভয়ে শিক্ষার্থীকে আত্মহত্যা করতে হয় সেখানে শুধু অ্যাকাডেমিক যুক্তি তর্ক আদেও কতটা কার্যকর, সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

দুইবছর ব্যাপী সোশাল ডিসট্যান্স এর দোহাই দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও রেস্তোরা, শপিং মল, সিনেমা হল, পরিবহন সবই একপ্রকার সচল। ছাত্রছাত্রী সমাজকে আহ্বান, সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এই মূহুর্তে সময়ের দাবি, সেই দাবি মেনে ক্যাম্পাস খোলার লক্ষ্যে যাদবপুর ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমেছে। ক্যাম্পাস আনলক না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে, বৃহত্তর হয়ে উঠবে, এই আমাদের অঙ্গীকার।

দেশ বেচার পাইপলাইনঃ
অর্থনীতির বিজাতীয়করণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন

"পারলে তুমি বনিক ডেকে
গোধূলিও দাও বেচে
গোদাবরীও শুকিয়ে যাবে
থাকবেনা কেউ বেঁচে"
- ভারভারা রাও

'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'-এর অশ্বডিম্ব মোদি জমানার সাত বছরে কার্যত 'আম্বানী আদানি কা সাথ, দেশ কা বিনাশ'-এর নীল নকশায় পর্যবসিত হয়েছে। বিমুদ্রায়ন বা ডিমনিটাইজেশনের হাহাকার থেকে দেশ এখনও বেরোতে পারেনি, এরই মধ্যে মুদ্রায়ন বা মনিটাইজেশনের নামে এক প্রহেলিকা চাপিয়ে দেওয়ার তোরজোড় শুরু হয়েছে মোদিয় অর্থনীতির কল্যাণে। গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন'। আদতে দেশ বেচে দেওয়ার পাইপলাইন।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে আমোদিত এই প্রকল্প কার্যত দেশের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসের এক নতুন ছক। কিছুটা ঘুরিয়ে নাক ধরার মতো এখন বলা হচ্ছে দেশের সম্পত্তি বিক্রি হবেনা। মালিকানা থাকবে সরকারের হাতেই। বেসরকারী কোম্পানীকে লিজ দেওয়া হবে দেশীয় সম্পত্তি। ন্যূনতম ৪০ বছর হবে সেই লিজের সময়সীমা। আর লিজ দেওয়ার নাম করে দেশের সমস্ত সম্পত্তি থালা সাজিয়ে তুলে দেওয়া হবে কর্পোরেট কোম্পানীগুলোকে। আগামী চার বছরে আনুমানিক ছয় লক্ষ টাকা আয়ের ভিত্তিতে গুটিকয়েক কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়া হবে বিপুল পরিমাণ দেশীয় সম্পত্তি।

যে সম্পত্তিগুলি ভাড়ায় দেওয়া হবে তার তালিকাটা দেখে নেওয়া যাক- ২৬৭০০ কি মি জাতীয় সড়ক, ৮০০০ কি মি গ্যাস পাইপলাইন, ৪০০০ কি মি তেলের পাইপলাইন, ৪২৩০০ কি মি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, ২৮৬০০০ কি মি অপটিকাল ফাইবার টেলিকম লাইন, ৪০০টি রেল স্টেশন, ২৫ টি বিমানবন্দর, ৯ টি বন্দর, ১৬০ টি কয়লাখনি, ১৫০ টি ট্রেন, ২১০ লক্ষ টন খাদ্যশষ্য মজুত রাখার গুদাম- এই সমস্ত সম্পত্তি তুলে দেওয়া হবে বেসরকারী হাতে। সরকারী ঠিকাদাররা যুক্তি দেখিয়ে যাচ্ছেন এগুলো নাকি অব্যবহৃত সম্পত্তি! এগুলোকে ভাড়ায় খাটিয়ে যদি কিছু টাকা আয় হয়, তাতে ক্ষতি কী! কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির তালিকা দেখলে যে কোনো মানুষই বুঝতে পারবেন সরকারের এই কুযুক্তি আদতে ধোপে টেকার মতো না।

কিন্তু মোদির ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে কোনো যুক্তি-তর্কের পরোয়া না করেই এগিয়ে চলেছে দেশ বেচার অশ্বমেধের ঘোড়া। সরকারের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিলামদারের। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে আমাদের যা কিছু প্রাপ্তি, সবটাই নিলামে চড়েছে। বহু লড়াই-আন্দোলন-আত্মদানের মধ্য দিয়ে দেশের সম্পদকে 'পাবলিক প্রপার্টি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রক্রিয়া; তাকে 'প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী'-তে রূপান্তরের বৃত্তটা সম্পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর মোদি সরকার। কয়েকটি ঘরানার বশংবদ এক মুৎসুদ্দি সরকার, যার অভিষ্ট লক্ষ আদায় আদতে সংশ্লিষ্ট ঘরানাগুলির স্বার্থ পূরণেই শেষ হয়ে যায়।

স্বাধীনতাত্তোর ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘোষিত যে নীতি ছিলো, বিগত শতকের নয়ের দশকেই তাকে ভারত মহাসাগরের জলে বিসর্জন দিয়ে নয়া উদারবাদী পথকেই মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে এই দেশের শাসককুল। একবিংশ শতকের প্রায় শুরু থেকেই বহু ঢক্কানিনাদের বিশ্বায়িত বেলুন চুপসে যেতে শুরু করে; ফলে পুঁজির ক্ষমতাকে বাঁচাতে উগ্রজাতীয়তাবাদের হাত ধরে ফ্যাসিবাদের উত্থানেই রসদ খুঁজতে থাকে শাসকশ্রেণি। তার ফলশ্রুতি গত দশকে মোদির ক্ষমতালাভ। আর তার বহিঃপ্রকাশ মোদিয় অর্থনীতির এই মডেল। রাষ্ট্রীয় আদর্শে উগ্রজাতীয়তাবাদ হলেও অর্থনীতিতে বিজাতীয়করণই এই নীতির মূল ভরকেন্দ্র। আর এই স্ববিরোধীতার মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ভারতের মাটিতে।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে তাই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার যে শপথ, সেই শপথ আমাদের সম্মিলিত সমস্ত প্রাপ্তিকেই রক্ষা করার শপথ। দেশের সম্পদের আরেকবার নির্গমনের ব্রিটিশ মডেলের নয়া রূপকে প্রতিহত করার দায়টা আমাদের সবার।

-নীলাশিস বসু (আইসা রাজ্য সভাপতি)

পিছিয়ে পড়ল যারা, তারা গেল কোথায়?
(লকডাউন, দলছুট আর গিগ ইকোনমির কিসসা)

শহরের এক নামী রেস্তোরাঁর সামনের জাঁকজমক রোশনাই পেরিয়ে বাঁদিকের গলিতে ঢুকলেই চোখ যাবে একটি দেওয়াল লিখনের দিকে। কোন নির্বাচনী প্রচার বা প্রশাসনিক কাজের খতিয়ান নয়, হলুদ তেল রঙের গোটা গোটা অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে বিজ্ঞাপন -"স্যুইগির সাথে যুক্ত থেকে গর্ব অনুভব করুন!" শহর জুড়ে রকমারি ফ্লেক্স, থ্রিডি স্ক্রিনে ফুড ডেলিভারি অ্যাপের বিজ্ঞাপনের মাঝে এই দেওয়াল লিখন বড়ই বেমানান লাগে। সেই দেওয়াল ঘেঁষে ফুটপাথ ধরে লাইন করে দাঁড়ানো সারি সারি বাইক আর সাইকেলের ভিড়ে দেখা হয়ে যায় প্রতিমা, শুভ, আখতারুলদের সাথে। শহরের কাছে ওদের পরিচয় 'ডেলিভারি বয়', কোম্পানি অবশ্য একটি রাশভারী নাম দিয়েছে 'রাইডার'। মোবাইল স্ক্রিনে একটা টাচ, একটা ওটিপি আর আমাদের ট্যাঁকের 'সৌজন্যে' ওরা দৌড়ে বেড়ায় শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ঝড়-বৃষ্টি হোক কিংবা ভয়াবহ অতিমারী-পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক আখতারুলদের ছুটি আদৌ আছে কিনা নেই সেই ধোঁয়াশা কাটতে কাটতেই ফোনের স্ক্রিনে ভেসে আসে নোটিফিকেশন -লোকেশন বলছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাইকেলে পাড়ি দিতে হবে আট কিলোমিটার। পিঠের ভারী ব্যাগে যা আছে তা আখতারুলের এক সপ্তাহের রোজগারের সমান যেটা একটু বাদেই এসে পড়বে আমাদের প্লেটে এক্কেবারে গরম গরম, আর দরজা থেকেই টাকা নিয়ে আখতারুল পাড়ি দেবে পরবর্তী গন্তব্যে -অন্য অর্ডার, অন্য ওটিপি। যে দেওয়াল লিখন নিয়ে কথা হচ্ছিল, তা যখন লেখা হয়েছে তখনও নামজাদা দৈনিকের সম্পাদকীয়তে 'গিগ ইকোনমি' শব্দবন্ধের স্থান জোটেনি; 'ওটিপি', 'লোকেশন' ইত্যাদি শব্দরা আমাদের স্বাভাবিক জীবনের অভিধানে ঢুকে পড়েনি। এই দেওয়াল যখন লেখা হয়েছিল তখন শুভ-প্রতিমারা পড়াশুনা করত, নিজেদের ক্ষুদ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিসর পেরিয়ে ওদের স্বপ্নরা খুঁজে নিত কোন নামী বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিগ্রীর ঠিকানা। এখন ওরা আর পড়াশোনা করেনা, খাবার পৌঁছে দেয় জায়গায় জায়গায়। দৈনিক গড় রোজগার আশি থেকে একশো কুড়ি টাকা।

মোদের কোন ভাষা নাই!

আমাদের দেশে পরিযায়ী শ্রমিকরা মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারে বাড়ি ফেরার তাড়নায়। আমরা ড্রয়িং রুমে বসে তা নিয়ে পদ্য করি, খানিক পর আমাদের সমবেদনারা গতিপথ পরিবর্তন করে চলে যায় অন্য ঘটনায়, অন্য যাপনে। পরিযায়ী শ্রমিকরা হাঁটতে হাঁটতে পরিবার সমেত ট্রেনের চাকায় পিষে যায় অথচ প্রশাসনের কাছে কোন তথ্য থাকেনা। ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে বলা হয় 'তথ্যই সম্পদ', তথ্যই রচনা করে ভাষ্যের। অথচ আখতারুলদের মত যারা লকডাউনে পরিবারে রোজগারের অভাব আর অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার জোড়া ধাক্কায় তছনছ হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দিল বা বলা যায় ছাড়তে বাধ্য করা হল তাদের বিচ্ছিন্নতার চলন বা গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশাসনের খুব

একটা মাথাব্যথা নেই। কিছু গবেষক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক দল এই নিয়ে চর্চা করলেও সেই পরিসর পিপীলিকাসম। সেই গবেষণাতেও যেটুকু তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে তা রাষ্ট্রের কাছে এতটাই বিপদজনক যে সেই তথ্যও জনমানসের আলোচনায় উঠে আসতে পারছে না। সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজের রিপোর্ট বলছে, গ্রামীণ ভারতে মাত্র ৮% এবং শহরে মাত্র ২৪% ছাত্রছাত্রীরাই এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পেরেছে। যারা পারেনি তারা হয় অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে অভাবের তাড়নায়, পিঠে ঝুলিয়েছে 'পরিযায়ী শ্রমিকের' তকমা বা আখতারুল-শুভদের মত সাইকেল কিংবা ভাড়ার বাইক নিয়ে ভিড় জমিয়েছে নামী রেস্তোরাঁ বা শপিং মলের আশেপাশে। সমস্ত হিসেবই যে এত সহজ, সাদা-কালো বাইনারীতে হয়েছে এমনটা নয় কিন্তু যে সময়ে আখতারুল-শুভদের পড়াশোনার প্রতি, তাদের দৈনন্দিন যাপনের প্রতি আরও বেশি করে যত্নশীল হওয়ার কথা ছিল প্রশাসনের, ঠিক সেই সময়ই কাকতালীয়ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ ১০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয় -এই দ্বন্দ্বের সহাবস্থানে দলছুটদের নিয়ে ভাবনার অবকাশ বাকীদের নেই। আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশুনা করার স্বপ্ন দেখা সায়ন এই বছর ডিস্টেন্স মোডে উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, "গত বছরের স্কুল ছেড়ে দিতে হল ফি না দিতে পেরে। ...আমরা হলাম গিয়ে ওই ভোটার। বাকি সরকারের সাথে, দেশের সাথে আমাদের কোন পরিচয়ও নেই, সম্পর্কও নেই! ...দমে যাওয়ারও সামর্থ্য নেই। যা বোঝার নিজেই বুঝে নিচ্ছি।" সায়নদের মত অনেকেই রোজ এই কাজ করে, দশ-পনেরো টাকা বাঁচিয়ে পড়াশোনা চালানোর স্বপ্নটা অক্ষত রাখতে চাইছে। কতটা পারছে সেটা দৈনিক রোজগার আর সঞ্চয়ের মধ্যেকার শূন্যতাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা থেকে খানিক আন্দাজ করা যেতে পারে। অনেকের কাছেই নিজের উদ্যোগে পড়াশোনায় ফিরে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ। "এই কাজ থেকে যেটুকু পাই তাতে পরিবারের এক বেলা খাবারটুকু জোটে। এই টাকায় রোজের বেঁচে থাকাটুকুই হয়। পড়াশোনা করার ইচ্ছে থাকলেও সেটা এখন ওই বিলাসিতাই।", একমনে মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে শুভম, "কম্পিউটারটা ভালই চালাতে জানি, যদিও নিজের নেই। ওটা নিয়ে পড়াশুনা করার ইচ্ছে ছিল। বেসরকারি ব্যাংকে চাকরিও পেয়েছিলাম একটা। তখন পড়াশোনাটা ছিল সাথে। লকডাউনে চাকরিটা গেল।...এই

কাজে এসে দেখছি সবার অবস্থাই প্রায় আমার মতই!" জনবাদী রাজনীতির ভিড়ে শুধুমাত্র মাসে ৫০০ টাকার স্কলারশিপ বা রিলিফ প্যাকেজ দিয়ে এই যাত্রায় সরকারের খানিক মান হয়ত বাঁচবে কিন্তু এই গভীর ক্ষতর চিকিৎসা আদৌ হবে কি?

কাস্টমার ইজ কিং! (বাকিটা খরচের খাতায়)

লগ্নিপুঁজি, ডিজিটাল প্রযুক্তি আর নয়া উপভোক্তা সংস্কৃতির এই অদ্ভুত মিলেমিশে রাইডারদের কাছে কাজের সুরক্ষা, কাজের সময়ের সাথে পারিশ্রমিকের সাযুজ্য -সবটাই যেন এক মস্ত হেঁয়ালি। সেখানে দৈনিক নূন্যতম মজুরি, শ্রম সুরক্ষা এইসব কথা বলা মানে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাওয়ার ভয়। ফুড ডেলিভারি কোম্পানিগুলোর রমরমা বাড়ার সাথে সাথে সরকারি ভাষণে রোজগারকরণের সংখ্যা বেড়ে চলে -সকালে উবের বাইক, বিকেলে জোমাটোয় কাজ করা আনোয়ারের নামের পাশে সরকারি হিসেবে দুটো চাকরি থাকলেও দৈনিক আয় সেই তিমিরেই রয়ে যায়। প্রশ্ন জমা হয় অনেক - এই চাকরি, এই রোজগার, এই কাজ, এই উন্নয়ন - কার স্বার্থে? এই সংখ্যার খেলায় চিরাচরিত শ্রম সংস্কৃতি আর কাঠামোর ভাঙনে -ফায়দা কার? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে গিগ ইকোনমির ধ্বজাধারী নয়া উদারবাদ সামনে নিয়ে আসে মোক্ষম স্লোগান - 'কাস্টমার ইজ কিং', অর্থাৎ সবটাই মুখ বুজে মেনে নিতে হবে উপভোক্তার স্বার্থে। একদিকে শ্রমিকের সাথে উপভোক্তার দ্বন্দ্ব ত্বরান্বিত হবে অন্যদিকে মুনাফার সিংহভাগ নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠবে কোম্পানি - দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান ড্রিম! টানা চারদিন বৃষ্টিতে যখন কলকাতা জলমগ্ন তখনও অর্ডার এসেছে রাহুলের ফোনে। "যে সব অঞ্চলে কোমর জলের জন্য যেতে পারিনি, ফোন করে

কাস্টমারকে জানিয়েছি, তারা বুঝেছেন। অথচ অর্ডারের টাকা কোম্পানি আমার থেকেই কেটে নিয়েছে!" রাহুলদের কাছে এইসব ঘটনা এখন স্বাভাবিক, যেন এইটাই নিয়ম। অভিযোগ জানানোর জায়গা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, যেখানে ক্লাস মনিটরের মত বসে আছে সেই কোম্পানির প্রতিনিধিই -'মায়ের কাছে মাসির গল্প!' পেট্রোলের খরচ বাড়লে মাঝে মধ্যে কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া যায় 'পেট্রোল ইনসেন্টিভ'। সেই ইনসেন্টিভের পরিমান শুনলে তাকে ভিক্ষাই বলা চলে। অনেকে আবার তা কোম্পানীকেই ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন -আমাদের মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পের কথা। প্রত্যেক কিলোমিটারে রোজগার বাড়ে পাঁচ টাকা, তেল পোড়ে কখনও কখনও তার দ্বিগুণ। বেকারত্বের দশকে সবটাই চলে লোকসানকে সঙ্গে করে, চলে বিকল্প রোজগারের সন্ধানও।

দশ থেকে দশ হাজার!

শোষণের চরিত্র যতই ছদ্ম হোক, প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে জায়গায় জায়গায়, জোরালো ভাবে - মহারাষ্ট্র, চেন্নাই, কলকাতায় রাইডারদের ডাকা ধর্মঘটের চাপে সরকার বাধ্য হচ্ছে আলোচনায় বসতে। ইউরোপিয়ান কিছু দেশ বা আমেরিকার কিছু অংশের মত এখানেও রাইডাররা নিজেদের ইউনিয়ন সংগঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, লাইসেন্স বাতিলের হুমকিকে তোয়াক্কা না করে পাল্লা দিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন বিলিয়নেয়ার কোম্পানিদের সাথে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে কখনও আবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে রাস্তায় নেমে তারা বুঝিয়ে দিচ্ছেন নূন্যতম মজুরি, শ্রম সুরক্ষা, কাজের সময় সবটাই হবে শ্রমিকের স্বার্থে, কোম্পানির প্যাঁচানো গোল গোল কথায় আর চিঁড়ে ভিজবেনা। একদিকে এই চটক অর্থনীতিতে শ্রমিকের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লড়াই, অন্যদিকে দলছুট শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণের বাস্তবায়ন - এই দুইয়ের সমন্বয়ের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে আগামীর সম্ভাবনা। স্কুল-কলেজ স্বাভাবিক ভাবে খোলার পরেও হয়ত বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছতে থাকবে প্রতিমা-শুভ-আখতারুলদের হাত ধরে। দশ টাকা বাড়তি টিপস, ঠান্ডা জলের বোতল বা একটা সেলফি তুলে নেওয়াতে হযত আত্মতুষ্টির জায়গা থেকে যায়, কিন্তু অন্ধ হলে তো আর প্রলয় বন্ধ থাকে না!...

-সৌমেন্দু মিত্র (আইসা কলকাতা জেলা সম্পাদক)

সংগঠনের পাতা থেকে

কৃষক আন্দোলনের পাশে ছাত্রছাত্রীরা

নয়া তিন কৃষকবিরোধী কৃষি আইনের বিরুদ্ধে, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ডাকে, ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ কর্মসূচিতে দেশজুড়ে সাড়া মিলেছে। দেশব্যাপী সংগ্রামী কৃষক জাগরণ সংগঠিত হতে দেখা গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও সর্বস্তরের জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উজ্জীবিত হয়ে ওঠা বনধ পালিত হয়। রাজ্যের ২৪টা জায়গায় জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ ছিল। অখিল ভারতীয় কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতির ব্যানারে কৃষক সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পথসভা করে। বালি, বেলঘরিয়া, কলকাতা, বজবজ, হুগলি সহ রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে বনধ-এর কর্মসূচিতে আইসা'র ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত থেকেছে। সর্বোপরি বলা যায়, জনবিরোধী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দীর্ঘজীবী করতে ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষকেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৩রা অক্টোবর, উত্তরপ্রদেশে লাখিমপুর খেরিতে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল উত্তরপ্রদেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র-র ছেলে আশীষ মিশ্র। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে, ৪ অক্টোবর, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ডাকে গোটা দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সারা রাজ্যে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা।

সংগঠনের পাতা থেকে

একুশের টিচার্স ডে

পাথরের গায়ে দিনলিপি রাখতো গুহামানব... মুঠোফোনের কিপ্যাডটা আমাদের থেকেও বেশি স্মার্ট হয়ে গিয়ে এখন সে'সব আষাঢ়ে গপ্পো লাগে? কিচ্ছু করার নেই, আষাঢ় মাস থেকেই যে ভোগান্তির নোটবুকে গপ্পের মত সত্যি (নাকি উল্টোটা) লেখা শুরু হয় খানাকুল জুড়ে– ওপাশে ঘাটাল। বন্যা ঠেকাতে কত যে 'মাস্টার প্ল্যান'-এর ঢাক বাজলো, অতঃপর সে'সব প্ল্যানের প্রতিমা বন্যার জলেই বিসর্জন। জমানা পাল্টে পাল্টে মাস্টারি চলে, 'মাস্টার প্ল্যান' আর পৃথিবীর আলো দেখেনা। আজ মাস্টারমশাই দিবসে 'একুশের ডাক' আর আইসা'র ছাত্রছাত্রীদল পৌঁছালো চাঁদকুণ্ডু ও সুন্দরপুরের (ব্লক- খানাকুল ২; পঞ্চায়েত- মাড়োখানা) নেইবারহুডে, সভ্যতার শিক্ষকদের সম্মান জানাতে। ত্রাণ বা জ্ঞান কিছু দিয়েই দিন বদলাবে না, কেবল সাময়িক সাহারা। লক্ষ্য থাকুক ডিজিটাল বৈষম্যের উল্টো ফুটে দাঁড়িয়ে আগামীদিনে সাধ্যমতো মেঠো পাঠশালার বিকল্প নির্মাণে, ভরসা থাকুক অনেক কাঁধে। স্বপ্নটা বিছানার থেকেও বেশি জরুরি জল-কাদায় দাঁড়িয়ে দেখা।

৫ই সেপ্টেম্বর, শিক্ষকদিবসে, বেলঘরিয়ায় দেশপ্রিয় নগরে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং সহায়িকা পুস্তকের লাইব্রেরী উদ্বোধন করেন বেলঘরিয়া দেশপ্রিয় বিদ্যানিকেতন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অবনীরঞ্জন হালদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত এবং ব্যারাকপুর তালপুকুর ক্ষেত্রমোহন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক শৌভিক ঘোষাল। কবিতা আবৃত্তি করে ছাত্র তনুজ ও উৎপল। সংগীত পরিবেশনা করে বহ্নিমান, আহিলী, অয়ন্তিকা এবং শায়ন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে ছাত্র অয়ন।

কোভিড কালে শিক্ষক দিবসে উপযুক্ত পদক্ষেপ Allied Library for Academic Purpose এক কথায় ALAP বা আলাপ। বঞ্চিত মানুষের শিক্ষার অধিকার অর্জনের সংগ্রাম এগিয়ে চলুক।

‘সঙ্ঘের দখলদারি’, সরব শিক্ষক-পড়ুয়ারা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করে দেওয়ার বিরুদ্ধে ৩১ অগস্ট আইসা'র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আয়োজিত কনভেনশনে থেকে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকেরা দৃঢ় কণ্ঠে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর অপসারণের দাবি তোলে। এই কনভেনশন বার্তা দেয়, বিশ্বভারতীকে অচলায়তনে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার্থে ছাত্রসমাজ বদ্ধপরিকর।

সম্মেলনের খবর

১০ই সেপ্টেম্বর, আইসা'র বজবজ জোনাল কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন সফল হয়। নব নির্বাচিত কমিটির সম্পাদক কমরেড অনন্যা মালিক এবং সভাপতি শ্রাবণী নাথ। আগামী দিনে ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এবং গণতান্ত্রিক পরিসরকে আরও বৃহৎ করতে, ছাত্রছাত্রী স্বার্থে আইসা লড়াই করতে বদ্ধপরিকর।

৫ই সেপ্টেম্বর, আইসা'র বিষ্ণুপুর জোনাল কমিটির তৃতীয় সম্মেলন সফল হয়। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ১১ জনের বিভিন্ন মতামত আদান-প্রদানের পর খসড়া হাউসে পাশ হয়। পরবর্তী ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়। নব নির্বাচিত কমিটির সম্পাদক কমরেড সায়ন্তন রায় এবং সভাপতি রাখি ভট্টাচার্য্য। নয়া প্রজন্মের হাতেই থাক ভবিষ্যতের নিশান।

হোক আনলক

কোভিড বিধি মেনে অবিলম্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে, ৩০ আগস্ট, কলেজস্ট্রিটে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন, মঞ্চ, পত্রিকা, ইউনিয়নের ডাকে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই গণকনভেনশনে আইসা'র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট সভাপতি কমরেড রুদ্র এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সৌমেন্দু, 'মিহির রায়চৌধুরী স্মারক লাইব্রেরি'র পক্ষ থেকে অত্রি, 'শহীদ প্রশান্ত পাল পাঠশালা'র তরফে সায়ন্তন, 'স্কীম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন'-এর পক্ষ থেকে কমরেড শীলা, 'শিক্ষক ঐক্য যুক্ত মঞ্চ'-এর তরফে ছবি চাকী, 'সনজিৎ মুর্মু পাঠশালা'র তরফে প্রতাপ ও অন্যান্যরা।

এর পরবর্তীতে, ৪ঠা অক্টোবর আইসা-সহ অন্যান্য বহু ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে একই দাবিতে বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। ন্যায্য দাবির এই মিছিল থেকে প্রায় ৫২ জন প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীকে বিধাননগর পুলিশ গ্রেফতার করে।

শাসকের চোখ রাঙানিকে কখনোই ছাত্রছাত্রীরা ভয় পায়নি। হামলা ও মামলা দিয়ে আন্দোলনের গতি কমানো যায়না। আগামীদিনে, দ্রুততার সঙ্গে ক্যাম্পাস না খুললে আন্দোলনের গতি বাড়িয়ে ছাত্রছাত্রীরা বারবার রাজপথের দখল নেবে; কথায়-স্লোগানে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিয়েছে পড়ুয়ারা।

বিজেপি-আর.এস.এসের দেশপ্রেমের স্বরূপ সামনে আনতে সংগ্রহ করুন *'প্রতিরোধে আমার দেশ'* প্রকাশিত

'কারা দেশদ্রোহী?'

সহায়ক মূল্য- ৩০ টাকা। যোগাযোগঃ ৭৯৮০৫৬০৭৩৪